সমকাল
05 NOV 2025

তুলা রপ্তানিতে জটিলতায় পড়ছেন মার্কিন ব্যবসায়ীরা

সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশে তুলা রপ্তানিতে বাণিজ্যিক ডকুমেন্টেশন প্রস্তুতের কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতার অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা রপ্তানিকারকদের সংগঠন কটন ইউএসএ। সংগঠনটির নেতারা বলেছেন, মার্কিন তুলা ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাকের মান আরও উন্নত করা সম্ভব। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা কাজে লাগিয়ে রপ্তানি আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। ডকুমেন্টেশন জটিলতা দূর করতে বিজিএমইএর সহযোগিতা চেয়েছেন তারা।

তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে কটন ইউএসএর নেতারা এসব কথা তুলে ধরেন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে ইউএস কটনের ৯ সদস্যের প্রতিনিধি দলে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের তুলা উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা ছিলেন। অন্যদিকে বিজিএমইএর পক্ষে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। এ ছাড়া সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান বাবলু ও পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা আলোচনায় অংশ নেন।

বৈঠকের মূল বিষয় ছিল ন্যূনতম ২০ শতাংশ মার্কিন তুলা ব্যবহারে উৎপাদিত বাংলাদেশের পোশাকে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধার বিষয়টি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে জারি হওয়া শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী, দেশটির বাজারে রপ্তানিযোগ্য কোনো পণ্য উৎপাদনে যদি ন্যূনতম ২০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, তাহলে ওই পণ্যে যতটুকু মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়েছে, তার মূল্যের ওপর ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক প্রযোজ্য হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক প্রায় ৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ এই ৮৮ শতাংশে শুল্ক ছাড় পাওয়ার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের। অবশ্য পণ্যে তুলার বাইরে

বিজিএমইএর সঙ্গে বৈঠকে কটন ইউএসএর অভিযোগ

এক্সেসরিজসহ অন্য কাঁচামালের যতটুকু ব্যবহার, ততটুকুর ওপর নতুন শুল্ক কার্যকর হতে পারে।

জানতে চাইলে ইনামুল হক খান বাবলু সমকালকে বলেন, 'মার্কিন প্রতিনিধিরা আসলে তাদের তুলার বিপণন বাড়াতে এসেছে। আমরা চাহিদার খুব অল্প তুলাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করে থাকি। এ হার এত কম কেন, কীভাবে বাড়ানো যায়– বিশেষ করে মার্কিন তুলা ব্যবহারে উৎপাদিত পোশাকে ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক ছাড়ের যে সুযোগ রয়েছে, সেটা কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে মার্কিন তুলার একটি ওয়্যারহাউস নির্মাণের বিষয়েও কথা হয়েছে। এটিকে বড় সম্ভাবনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তুলা আগাম আমদানি করে ওয়্যারহাউসে রাখা হবে, যাতে সারাবছর যে কারখানার যতটুকু প্রয়োজন তারা তাৎক্ষণিকভাবে ততটুকু নিতে পারে। এতে তুলা আমদানিতে ৩৫ দিন থেকে ৪০ দিনের যে সময় বা লিড টাইম লাগে সেটা বাঁচবে।

সূত্র জানায়, বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধিরা বলেন, বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন তুলা তার টেকসই গুণাবলি, নির্ভরযোগ্যতা এবং উচ্চমানের জন্য সুপরিচিত। মার্কিন তুলা ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা তাদের পণ্যের মান আরও উন্নত করতে পারবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারিত করতে পারবে। তবে বাংলাদেশে তুলা রপ্তানিতে বাণিজ্যিক ডকুমেন্টেশন প্রস্তুতের কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে বিজিএমইএর সহযোগিতা প্রয়োজন।

বিজিএমইএ সভাপতি বাংলাদেশে তুলা রপ্তানিতে বাণিজ্যিক ডকুমেন্টেশন-সংক্রান্ত সমস্যার বিস্তারিত জানতে চান। এ বিষয়ে সমস্যাগুলো সুনির্দিষ্ট করে লিখিত আকারে বিজিএমইএকে জানাতে মার্কিন প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন তিনি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এ বিষয়ের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা বা জটিলতাগুলো দ্রুত নিরসনের চেষ্টা করা হবে।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, এই নতুন শুল্ক ছাড়ের সুযোগ বাংলাদেশের শিল্প খাতের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনা এনে দিয়েছে, যা আমাদের পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। তবে তিনি উল্লেখ করেন, এ সুবিধা বাংলাদেশের স্পিনিং মিল ও পোশাক কারখানাগুলো কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাভ করবে, সে বিষয়ে এখনও বিজিএমইএর কাছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। মার্কিন প্রশাসনের কাছ থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় স্পষ্টীকরণ ডকুমেন্টস বিজিএমইএকে সরবরাহ করা হলে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। এতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা শুল্ক সুবিধা নিতে প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

মাহমুদ হাসান খান আরও বলেন, বর্তমানে আমদানি করা তুলার প্রায় ১০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে, যা দ্বিগুণ বা তিন গুণ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ বছরে ৪৮০ কোটি থেকে ৫২০ কোটি ডলারের তুলা আমদানি করে। মোট তুলার ৫০ শতাংশ ভারত থেকে আসে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশ থেকেও তুলা আমদানি করা হয়।

প্রথম আলো
05 NOV 2025

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন আনা হবে

আগ্রহপত্র সই

যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও ডেল্টা অ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ আগ্রহপত্র বা এলওআই সই করেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের তিনটি বড় শিল্পগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক বছরে এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের সয়াবিনবীজ আমদানি করবে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, সিটি গ্রুপ ও ডেল্টা অ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ।

এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইউএস সয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিল (ইউএসএসইসি) ও ইউএস সয়ের সঙ্গে দেশীয় তিন প্রতিষ্ঠান আগ্রহপত্র (এলওআই) সই করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত এলওআই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য আফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন, ইউএসএসইসির নির্বাহী পরিচালক কেভিন এম রোপকি; মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ও পরিচালক তানজিমা বিনতে মোস্তফা; সিটি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. হাসান; ডেল্টা অ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের এমডি আমিরুল হক; স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নাসের এজাজ বিজয়সহ প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ডেল্টা অ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের এমডি আমিরুল হক বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের মান সব সময়ই অন্যদের চেয়ে ভালো থাকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিনবীজের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক। আমাদের সামনে আরও অনেক সুযোগ রয়েছে। আমরা চাইলে বাংলাদেশে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করতে পারি। দুই দেশের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ছয় বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য-ঘাটতি রয়েছে। আমরা এলপিজি, অপরিশোধিত তেল ও সয়াবিন আনতে পারলে দুই দেশের মধ্যে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হবে।'

মেঘনা গ্রুপের পরিচালক তানজিমা বিনতে মোস্তফা বলেন, 'আমরা গর্বিত যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন আমদানির মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্য ও পশুখাদ্যের সরবরাহব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার অংশীদারত্বে যুক্ত হতে পেরেছি। গত এক বছরে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছি। এ বছর মেঘনা গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০ লাখ টন সয়াবিন আমদানির পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে সেই লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

তানজিমা বিনতে মোস্তফা আরও বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছি তাদের পণ্যের মান, পরিবহনব্যবস্থা ও স্বচ্ছ নিয়মভিত্তিক বাণিজ্যের কারণে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আগ্রহপত্র বা এলওআই স্বাক্ষর দেশে খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, কৃষিশিল্পকে আরও জোরদার করা এবং টেকসই সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। বর্তমানে সয়াবিন আমদানিতে যে শুল্ককাঠামো রয়েছে, তা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করছে। শুল্ককাঠামো ঠিক করা হলে পোলট্রি ও মৎস্য খাতের খাদ্যের দাম সাশ্রয়ী থাকবে।'

সিটি গ্রুপের এমডি মো. হাসান বলেন, 'বাংলাদেশের খাদ্য সরবরাহব্যবস্থায় গুণগত মান বজায় রাখা ও তা টেকসই করে তুলতে আমরা সব সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা উচ্চমানের মার্কিন সয়াবিনের ব্যবহার বাড়াতে চাই। এতে ভোক্তাদের কাছে উন্নতমানের পণ্য পৌঁছে দেওয়া যাবে। তাতে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে। এই এলওআই দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় এবং কৃষি উদ্ভাবন ও অগ্রগতির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।'

এলওআই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য আফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন বলেন, 'আমরা আসলে দুই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা বলছি, যেখানে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ৭৭ কোটি ৯০ লাখ ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। আর এ বছর তা এক বিলিয়ন ডলারের বেশি হবে বলে আশা করছি।'

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী সয়াবিনবীজ আমদানি হয় মূলত ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে। গত অর্থবছরে সব মিলিয়ে ৭৮ কোটি ডলারের ১৭ লাখ ৩৫ হাজার টন সয়াবিন আমদানি হয়েছিল। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা হয়েছিল ৩৫ কোটি ডলারের সয়াবিনবীজ, যা এবার আরও বাড়তে পারে বলে ব্যবসায়ীরা মনে করেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
05 NOV 2025

তিন মাস ধরে কমছে রফতানি প্রবৃদ্ধি অক্টোবরে কমেছে ৭.৪৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▫

দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চাঞ্চল্যের মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি ছিল রফতানি আয় ও রেমিট্যান্সে। কিন্তু চলতি অর্থবছরের চার মাস পর রফতানি খাতের সামান্য ফিকে হয়ে এসেছে। টানা তিন মাস ধরে রফতানি আয় কমছে। বিশেষ করে অক্টোবরে দেশের রফতানি আয় ৭ দশমিক ৪৩ শতাংশে পতন ঘটেছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে গতকাল প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্য বলছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অক্টোবরে দেশ থেকে ৩৮২ কোটি ৩৯ লাখ ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই মাসে ৪১৩ কোটি ৮ লাখ ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছিল। সে হিসাবে গত মাসে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রফতানি কমেছে ৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এর আগে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরেও রফতানি কমেছে। আগস্টে রফতানি কমার হার ছিল ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ আর সেপ্টেম্বরে কমেছিল ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ। রফতানি আয়ের ধারাবাহিক এ নেতিবাচক চিত্র অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে বলেই ধরে নেয়া যায়।

রফতানির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের অন্যতম উৎস প্রবাসী আয়। এ দুই উৎস দেশের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। রফতানি আয় ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স যত বাড়ে, ততই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ে। ফলে দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, ঋণ পরিশোধ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হয়। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যত শক্তিশালী হয়, ততই দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা উন্নত হয়। ফলে টেকসই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হয়। কিন্তু তিন মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে রফতানি আয় কমায় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হবে বলে ধরে নেয়া যায়। রফতানি আয় হ্রাস পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রভাব কমবে ও দেশের রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি করবে। এতে ডলার সংকট দেখা দেবে। আমদানি ব্যয় মেটানো, ঋণ পরিশোধ ও মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা হুমকিতে পড়বে।

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত অক্টোবরে তৈরি পোশাক, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হিমায়িত চিংড়ি, প্লাস্টিক পণ্যের রফতানি কমেছে। তবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, চামড়াবিহীন জুতা ও প্রকৌশল পণ্যের রফতানি বেড়েছে। মূলত তৈরি পোশাকের রফতানি ৮ শতাংশ কমে যাওয়ায় সামগ্রিক পণ্য রফতানি নেতিবাচক ধারায় চলে গেছে। তৈরি পোশাকের রফতানি কমে যাওয়ার পেছনে আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকালীন অস্থিরতার আশঙ্কায় ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিয়েছেন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকগুলোর সংকটের কারণে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খুলতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা।

দেশের রফতানি খাতের প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক, যা মোট রফতানির ৮০ শতাংশেরও বেশি। ফলে এ পণ্যের রফতানির গতিপ্রকৃতি সার্বিক রফতানিতে প্রভাব ফেলে। তাই সামগ্রিক রফতানিতে পোশাক রফতানি কমার প্রভাব বিদ্যমান। যদিও দেশের সর্বোচ্চ রফতানি আয় অর্জনকারী পোশাক খাতকে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের কারণে দেশের পোশাক খাত নানা চাপে রয়েছে। পাশাপাশি পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও নতুন বাজার অনুসন্ধানে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। অথচ অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বহুমুখী উদ্যোগের মাধ্যমে রফতানি সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

রফতানি খাতকে বৈচিত্র্যময় ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকারকে নীতিসহায়তা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাও দূর করতে উদ্যোগী হতে হবে। কয়েকটি পণ্য ঘিরে নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। পোশাক খাতের ওপর অতিনির্ভরতা কমিয়ে আনতে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। আয় বাড়াতে নির্দিষ্ট কিছু দেশের সঙ্গে রফতানি বাণিজ্য সীমাবদ্ধ রাখাটা কোনোভাবেই সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। রফতানির জন্য অপ্রচলিত পণ্য খুঁজে বের করার পাশাপাশি রফতানি গন্তব্যের নতুন নতুন দেশ অনুসন্ধান করার দিকটিতে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্কের প্রভাবে তৈরি পোশাক খাতে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে, যা গোটা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় পণ্য রফতানি ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেবে। একইভাবে অপ্রচলিত নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টি রফতানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটাবে। রফতানি বহুমুখীকরণকে একক বা বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে শিল্প নীতি, আমদানি নীতি, আর্থিক নীতি ও অন্যান্য নীতির সামঞ্জস্য রাখা জরুরি। নীতিসহায়তা ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রফতানি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।

শুধু তৈরি পোশাক খাতেই নয়, শিল্পের মূলধনি যন্ত্রপাতি, মধ্যবর্তী পণ্য ও কাঁচামাল আমদানির এলসি নিষ্পত্তিও কমেছে। অর্থাৎ শিল্প খাতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নতুন বিনিয়োগ বা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। মূলধনি যন্ত্রপাতির এলসি নিষ্পত্তির হার কমে যাওয়ার অর্থ নতুন কারখানা স্থাপন বা পুরনো কারখানার আধুনিকায়ন কমেছে। ফলে শিল্প খাতে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ব্যাংক জটিলতাসহ নানা কারণে শিল্প খাত বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত স্থবির অবস্থায় রয়েছে। যদি এ প্রবণতা অব্যাহত থাকে তাহলে রফতানি আয়, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক চাপে পড়বে।

বেসরকারি খাতে ঋণ হতাশাজনক। দেশের বে এখন গত দুই দশকের বছরের সেপ্টেম্বরে বেসর মাত্র ৬ দশমিক ২৯ শতা পর্যালোচনা করে দেখা য দেশের বেসরকারি খাতে সর্বনিম্নে নেমে এসেছিল নয়, বরং বেসরকারি খা চলে যায়। অর্থনীতিবিদর দশকে কোনো যাচাই-বাছ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এখন খেলাপির তালিকায় ঋণ দেয়ার সক্ষমতা শূন্যে উৎপাদনের মূল ভিত্তি হলে খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে

রফতানি আয় হ্রাস, ঋ খাতের সংকট—সব মিলি বিরাজমান। এ ধরনের স দীর্ঘস্থায়ী মন্দার দিকে ঠেলে অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলা বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ফেলছে। রাজনৈতিক স্থিতি গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নি দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশী গতিশীলতা ফিরতে পারে সংক্রান্ত যেসব সমস্যা বিদ্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

বণিক বার্তা
05 NOV 2025

স ধরে কমছে রফতানি প্রবৃদ্ধি

ানি আয় বাড়াতে পণ্যে বৈচিত্র্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি

ন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম
াশ্বিক নানা বাধা ও অভ্যন্তরীণ সংকটের
রফতানি প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব
ন উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে
শত হালনাগাদ তথ্য বলছে, চলতি
বছরের অক্টোবরে দেশ থেকে ৩৮২
ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে।
২৫ অর্থবছরের একই মাসে ৪১৩
লারের পণ্য রফতানি হয়েছিল। সে
স আগের অর্থবছরের একই সময়ের
কমেছে ৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এর
সেপ্টেম্বরেও রফতানি কমেছে। আগস্টে
হার ছিল ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ আর
ল ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ। রফতানি
ক এ নেতিবাচক চিত্র অর্থনীতির ওপর
বলেই ধরে নেয়া যায়।
াশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের
াসী আয়। এ দুই উৎস দেশের
দের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ
য় ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স
দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ে।
ানি ব্যয় মেটানো, ঋণ পরিশোধ ও
ক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ
শিক মুদ্রার রিজার্ভ যত শক্তিশালী
অর্থনৈতিক সক্ষমতা উন্নত হয়।
ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মুদ্রাবাজারের
রাখা সহজ হয়। কিন্তু তিন মাস
রফতানি আয় কমায় অর্থনীতিতে
শ্যমান হবে বলে ধরে নেয়া যায়।
পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রভাব
জার্ভে চাপ সৃষ্টি করবে। এতে ডলার সংকট দেখা দেবে। আমদানি ব্যয় মেটানো, ঋণ পরিশোধ ও মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা হুমকিতে পড়বে।

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত অক্টোবরে তৈরি পোশাক, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হিমায়িত চিংড়ি, প্লাস্টিক পণ্যের রফতানি কমেছে। তবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, চামড়াবিহীন জুতা ও প্রকৌশল পণ্যের রফতানি বেড়েছে। মূলত তৈরি পোশাকের রফতানি ৮ শতাংশ কমে যাওয়ায় সামগ্রিক পণ্য রফতানি নেতিবাচক ধারায় চলে গেছে। তৈরি পোশাকের রফতানি কমে যাওয়ার পেছনে আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকালীন অস্থিরতার আশঙ্কায় ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিয়েছেন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকগুলোর সংকটের কারণে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খুলতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা।

দেশের রফতানি খাতের প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক, যা মোট রফতানির ৮০ শতাংশেরও বেশি। ফলে এ পণ্যের রফতানির গতিপ্রকৃতি সার্বিক রফতানিতে প্রভাব ফেলে। তাই সামগ্রিক রফতানিতে পোশাক রফতানি কমার প্রভাব বিদ্যমান। যদিও দেশের সর্বোচ্চ রফতানি আয় অর্জনকারী পোশাক খাতকে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের কারণে দেশের পোশাক খাত নানা চাপে রয়েছে। পাশাপাশি পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও নতুন বাজার অনুসন্ধানে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। অথচ অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বহুমুখী উদ্যোগের মাধ্যমে রফতানি সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

রফতানি খাতকে বৈচিত্র্যময় ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকারকে নীতিসহায়তা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাও দূর করতে উদ্যোগী হতে হবে। কয়েকটি পণ্য ঘিরে নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। পোশাক খাতের ওপর অতিনির্ভরতা কমিয়ে আনতে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। আয় বাড়াতে নির্দিষ্ট কিছু দেশের সঙ্গে রফতানি বাণিজ্য সীমাবদ্ধ রাখাটা কোনোভাবেই সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। রফতানির জন্য অপ্রচলিত পণ্য খুঁজে বের করার পাশাপাশি রফতানি গন্তব্যের নতুন নতুন দেশ অনুসন্ধান করার দিকটিতে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্কের প্রভাবে তৈরি পোশাক খাতে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে, যা গোটা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় পণ্য রফতানি ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেবে। একইভাবে অপ্রচলিত নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টি রফতানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটাবে। রফতানি বহুমুখীকরণকে একক বা বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে শিল্প নীতি, আমদানি নীতি, আর্থিক নীতি ও অন্যান্য নীতির সামঞ্জস্য রাখা জরুরি। নীতিসহায়তা ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রফতানি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।

শুধু তৈরি পোশাক খাতেই নয়, শিল্পের মূলধনি যন্ত্রপাতি, মধ্যবর্তী পণ্য ও কাঁচামাল আমদানির এলসি নিষ্পত্তিও কমেছে। অর্থাৎ শিল্প খাতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নতুন বিনিয়োগ বা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। মূলধনি যন্ত্রপাতির এলসি নিষ্পত্তির হার কমে যাওয়ার অর্থ নতুন কারখানা স্থাপন বা পুরনো কারখানার আধুনিকায়ন কমেছে। ফলে শিল্প খাতে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ব্যাংক জটিলতাসহ নানা কারণে শিল্প খাত বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত স্থবির অবস্থায় রয়েছে। যদি এ প্রবণতা অব্যাহত থাকে তাহলে রফতানি আয়, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ—সবকিছুই আরো চাপে পড়বে।

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির অবস্থা আরো হতাশাজনক। দেশের বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি এখন গত দুই দশকের বেশি সময়ের মধ্যে কম। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, চলতি বছরের জুনেই দেশের বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি ইতিহাসের সর্বনিম্নে নেমে এসেছিল। আর জুলাই ও আগস্টে প্রবৃদ্ধি নয়, বরং বেসরকারি খাতের ঋণ স্থিতি ঋণাত্মক ধারায় চলে যায়। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, বিগত দেড় দশকে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ফলে এসব ঋণের বড় অংশই এখন খেলাপির তালিকায়। এতে একাধিক ব্যাংকের ঋণ দেয়ার সক্ষমতা শূন্যের কোটায়। কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের মূল ভিত্তি হলো বেসরকারি খাত। অথচ এ খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত হতাশাজনক, যা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

রফতানি আয় হ্রাস, ঋণপ্রবাহে স্থবিরতা ও উৎপাদন খাতের সংকট—সব মিলিয়ে অর্থনীতিতে শ্লথগতি বিরাজমান। এ ধরনের সংকট সামগ্রিক অর্থনীতিকে দীর্ঘস্থায়ী মন্দার দিকে ঠেলে দিতে পারে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিকল্প নেই। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসলে অর্থনীতিতে গতিশীলতা ফিরতে পারে। এছাড়া ব্যাংক খাতে এলসি-সংক্রান্ত যেসব সমস্যা বিদ্যমান সেগুলো দ্রুত নিরসনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।

ঢাকা।

বণিক বার্তা
05 NOV 2025

বিজিএমইএর সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধি দলের বৈঠক

বাংলাদেশে তুলা রফতানিতে জটিলতার সমাধান চান যুক্তরাষ্ট্রের রফতানিকারকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে তুলা রফতানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ডকুমেন্টেশন প্রস্তুতে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের তুলা রফতানিকারকরা। এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সহযোগিতা চেয়েছেন তারা।

রাজধানীর উত্তরার বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে সংগঠনটির সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সঙ্গে গতকাল এক বৈঠকে এ দাবি জানান যুক্তরাষ্ট্রের তুলা রফতানিকারকরা। কটন ইউএসএর উদ্যোগে মার্কিন তুলা রফতানিকারকদের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল এতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় মূল আলোচনার বিষয় ছিল দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি, মার্কিন তুলার ব্যবহার সম্প্রসারণ ও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানিতে নবঘোষিত শুল্ক সুবিধা কাজে লাগানো।

মার্কিন তুলা রফতানিকারকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিজিএমইএ সভাপতি প্রতিনিধি দলকে লিখিত আকারে তাদের প্রস্তাব জানানোর আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন যে বিজিএমইএ বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যথাযথভাবে উপস্থাপন করবে, যাতে দ্রুত এ জটিলতাগুলো নিরসন করা যায়।

বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইকমের লি ইন, কারগিলের ক্রিস্টা রিকম্যান, এলডিসির ডিয়েগো লোজাদা, ওলাম এগ্রির ওয়েসলি রেন্টজ, ক্যারোলিনা কটন গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েন বোসম্যান স্ট্যাপলকটন কো-অপারেটিভের ক্রিস জোন্স এবং কটন কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনালের উইল বেটেনডর্ফ ও আলী আরসালান। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে সংগঠনটির পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান ও পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা।

বৈঠকে বাংলাদেশের পোশাক খাতে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা সরবরাহের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এ সময় আলোচনার কেন্দ্রে ছিল সম্প্রতি ঘোষিত মার্কিন নির্বাহী আদেশ। যেখানে পোশাক উৎপাদনে ন্যূনতম ২০ শতাংশ মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানির ক্ষেত্রে নতুন আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক থেকে আনুপাতিক হারে ছাড় পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান বলেন, 'এ নতুন শুল্ক ছাড়ের সুযোগ শিল্প খাতের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনা এনে দিয়েছে, যা আমাদের পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরো প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।' তবে তিনি উল্লেখ করেন, এ সুবিধা বাংলাদেশের স্পিনার ও পোশাক কারখানাগুলো কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাভ করবে, সে বিষয়ে এখনো ব্যবসায়ীদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

বিজিএমইএ সভাপতি প্রতিনিধি দলকে অনুরোধ জানান, তারা যেন মার্কিন প্রশাসনের কাছ থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় স্পষ্টীকরণ এনে বিজিএমইএকে সরবরাহ করেন। এতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা বিলম্ব না করে শুল্ক সুবিধা গ্রহণে দ্রুত প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

তিনি আরো জানান, মার্কিন তুলার উচ্চ গুণগত মান ও তুলনামূলক সুবিধা নিয়ে বিশদ গবেষণা করে স্পিনার ও কারখানাগুলোকে তথ্য সরবরাহ করা হলে তারা আমদানি বাড়াতে উৎসাহিত হবেন।

মার্কিন কটন কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিরা বলেন, বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন তুলা তার টেকসই গুণাবলি, নির্ভরযোগ্যতা ও উচ্চমানের জন্য সুপরিচিত। মার্কিন তুলা ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা তাদের পণ্যের মান আরো উন্নত করতে পারবে এবং মার্কিন বাজারে শুল্ক সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারিত করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন তারা।

এ সময় বাংলাদেশের বাজারে মার্কিন তুলা সরবরাহ আরো সহজ ও দ্রুত করতে লজিস্টিক ও অবকাঠামো উন্নয়নের উপায় নিয়েও আলোচনা করে উভয়পক্ষ। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি ত্বরান্বিত করতে একটি ওয়্যারহাউজ স্থাপন নিয়েও আলোচনা করা হয়। এটি বাস্তবায়ন হলে শিল্পের লিড টাইম কমবে বলে জানান তারা।

বিজিএমইএর পক্ষ থেকে দেশের টেক্সটাইল ও পোশাক কারখানাগুলোর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য মার্কিন প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানানো হয়। একই সঙ্গে ইনোভেশন সেন্টারে মিলগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপচয় কমাতে গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও জ্ঞান প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

উভয় পক্ষই ভবিষ্যতে দুই দেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরো জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়া নতুন শুল্কনীতি এবং মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করতে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে উভয়পক্ষই অঙ্গীকার করেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
05 NOV 2025

ইউএসএসইসির সঙ্গে আগ্রহপত্র সই

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন আনবে সিটি, মেঘনা ও ডেল্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন কিনবে বাংলাদেশের তিন শীর্ষ সয়াবিন প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান—মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও ডেল্টা এগ্রো ফুড। আগামী এক বছরে এ সয়াবিন আমদানি করা হবে। রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ইউএস সয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিল (ইউএসএসইসি) ও ইউএস সয়ের সঙ্গে দেশীয় তিন প্রতিষ্ঠান আগ্রহপত্র (এলওআই) সই করেছে।

অনুষ্ঠানে ইউএসএসইসির পক্ষে সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক কেভিন এম রুকা এবং বাংলাদেশের পক্ষে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল, ডেল্টা এগ্রো ফুডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক ও সিটি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাসান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক তানজিমা মোস্তফা, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নাসের এজাজ বিজয়সহ প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ডেল্টা এগ্রো ফুডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক বলেন, 'ইউএসএসইসির সঙ্গে সয়াবিন কেনার চুক্তি করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। শুধু সয়াবিনই নয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও এলপিজি আমদানি করতে পারি। চাহিদা অনুসারে এ তিনটি পণ্য আমদানি করা হলে বছরে এর পরিমাণ সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের মতো হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে।'

এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ভোক্তারা প্রতিযোগিতামূলক দামে সয়াবিন তেল পাবেন বলে জানান মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. মোস্তফা কামাল। গ্রুপটির পরিচালক তানজিমা মোস্তফা বলেন, 'আমরা আজকে শুধু একটি এলওআই স্বাক্ষর করছি না, বরং এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক ও আমাদের পরিবারের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করলাম।' বাণিজ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন বাধা দূর করার বিষয়ে তিনি উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ জানান।

সিটি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাসান বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সয়াবিন আমদানির এ চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে যাদের অবদান রয়েছে আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সিটি গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা ভোক্তাদের উচ্চমানসম্পন্ন সয়াবিনের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

সয়াবিন রফতানির মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন ইউএসএসইসির সিইও কেভিন এম রোপকে। সংগঠনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জিম সাত্তারও অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ উভয়েই এর মাধ্যমে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।'

এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন বলেন, 'বাংলাদেশের বাজার এখন যুক্তরাষ্ট্রের রফতানির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন বিক্রি আগামী বছর তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে করবে আরো সুদৃঢ়।'

যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে ২২১ কোটি ডলারের পণ্য। এ হিসাবে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ৬১৫ কোটি ডলারের। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্ক থেকে রেহাই পেতে দেশটির গম, এলএনজি, উড়োজাহাজসহ বেশকিছু পণ্য আমদানির মাধ্যমে

এরপর » পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত আগস্টে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এরই মধ্যে গম আমদানি শুরু করেছে বাংলাদেশ। সে ধারাবাহিকতায় এবার বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন আনার উদ্যোগ নিয়েছেন।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০-২২ লাখ টন সয়াবিন আমদানি হয়ে থাকে, যার সিংহভাগই আসে ব্রাজিল থেকে। তবে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির তুলনায় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিনের দাম কিছুটা কম থাকায় সেখান থেকে বাংলাদেশে সয়াবিন আমদানি বাড়তে পারে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। এরই মধ্যে মেঘনা গ্রুপ আট লাখ টন সয়াবিন আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

The Financial Express

05 NOV 2025

US cotton exports can be redoubled with proportionate tariff reduction

Bangladesh apparel makers say

FE REPORT

- US cotton exporters' del explores means of augmenting their product export
- Possibility of dedicated warehouse in BD to reduce lead time in American cotton supply under new US tariff regime discussed

Bangladesh's apparel exporters want to work jointly with American cotton exporters to secure proportionate tariff reductions through increased use of US raw materials in garment industry.

A recently announced US executive order allows proportionate tariff relief for apparel made with at least 20-percent American-origin raw materials-apart from the reciprocal Trump tariff regime that eventually lowered the rate for Bangladesh to 20 per cent in a tradeoff.

They expressed their interest in mutually beneficial trade enhancement during a meeting between a high-level delegation of US cotton exporters and Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Mahmud Hasan Khan Tuesday at the BGMEA Complex in Dhaka's Uttara.

The delegation's visit was facilitated by Cotton USA, an initiative of Cotton Council International (CCI), BGMEA said in a news release.

The discussion focused on expanding bilateral trade, promoting the use of US cotton in Bangladesh's textiles sector, and leveraging tariffs.

"This new tariff concession creates enormous opportunities for our industry as it will make our products more competitive on the global market," said BGMEA President Mahmud Hasan Khan.

However, he notes that the BGMEA has yet to receive clear guidelines on how local spinners and garment factories can qualify for the benefit. He urged the delegation to help obtain necessary clarifications from the US administration so that Bangladeshi exporters can begin preparation without delay.

Currently, around 10 per cent of Bangladesh's imported cotton originates from the United States. The BGMEA chief said this share could be doubled or even tripled through proper strategic initiatives and greater awareness about the superior quality and sustainability of US cotton.

He suggests conducting joint research and knowledge-sharing sessions with spinners and factories to highlight the benefits of using American cotton.

Welcoming the proposal, the delegation expressed readiness to work jointly with BGMEA to expand the use of US cotton in Bangladesh.

The delegation included Li Yin (ECOM), Krista Rickman (Cargill), Diego Lozada (LDC), Wesley Rentz (Olam Agri), Wayne Boseman (Carolina Cotton Growers Association), Chris Jones (Staplcotn Cooperative), and Will Bettendorf and Ali Arsalan of the Cotton Council International.

From the BGMEA side, Senior Vice-President Enamul Haque Khan and Director Nafis-ud-Daula joined the discussion.

The US representatives also pointed out certain challenges in trade documentation while exporting cotton to Bangladesh and sought BGMEA's cooperation in resolving these barriers.

In response, the BGMEA president requested the delegation to share the issues in writing so the association could formally raise them with the Ministry of Commerce for necessary action.

The CCI representatives lauded Bangladesh's textile and apparel industry as a key player on the global market, noting that American cotton is globally recognized for its consistency, sustainability, and reliability.

They expressed confidence that by using more US cotton, Bangladeshi manufacturers could enhance product quality and better utilize tariff relief on the US market.

The meeting also explored ways to streamline logistics and infrastructure for US cotton supply in Bangladesh, including the possibility of establishing a dedicated warehouse to reduce lead time.

Both sides agreed to work together to ensure transparency and traceability in measuring US raw-material content under the new tariff policy.

The host side further requested technical cooperation and capacity-building support from US cotton exporters to help improve productivity and reduce waste in local mills.

The association also invited collaboration in research activities through the BGMEA Innovation Centre to drive efficiency and sustainability in production.

Both parties reiterated their commitment to strengthening bilateral economic partnership and mutual cooperation in the years ahead.

newsmanjasi@gmail.com

তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা ★

কুমিল্লার কাগজ

05 NOV 2025

রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে কুমিল্লায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইপিবির মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক: রপ্তানি খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কুমিল্লা অঞ্চলের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী (অতিরিক্ত সচিব) মোহাম্মদ হাসান আরিফ। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা এয়রপোর্ট প্রসেসিং জোন (ইপিজেড) এর সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুমিল্লা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিজনেস ফোরাম, ইপিজেডভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ রপ্তানি প্রক্রিয়ার জটিলতা, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক সুবিধাসহ কুমিল্লায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মাছ, শাকসবজি ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানির সুযোগ চান, যাতে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পান। তারা অভিযোগ করেন, বিএসটিআই অনুমোদিত পণ্য ভারতে রপ্তানিতে বাধার মুখে পড়ছে, বিশেষ করে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ফেনী স্থলবন্দরে। -এরপর ৫ এর পাতায়

শেষের পাতার পর।। ব্যবসায়ীরা বলেন, বিদেশি শিল্পনীতির চাপে টিকে থাকতে হলে নতুন পণ্যে রপ্তানি বৈচিত্র্য আনতে হবে। সেই সঙ্গে কুমিল্লা বিমানবন্দর পুনরায় চালুর দাবি জানান তারা। যাতে ইপিজেড পণ্য পরিবহন সহজ হয়, বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে ও আঞ্চলিক রপ্তানি আরও গতিশীল হয়।

মতবিনিময় সভায় মোঃ হাসান আরিফ বলেন, খাদের মধ্য থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বহু চাপের মধ্যেও ব্যবসায়ীরা রপ্তানিতে ভূমিকা রাখছেন। বর্তমানে ৮০-৮১ শতাংশ রপ্তানি গার্মেন্টস নির্ভর যে কারণে একক পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা সংকট তৈরি করছে। এ অবস্থায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গার্মেন্টসের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ৭টি সেক্টরে রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি বলেন, রপ্তানি খাতের বিকাশে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ চলমান।

বিশেষ করে আঞ্চলিক শিল্পাঞ্চলগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়ন, লজিস্টিক সাপোর্ট ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা রপ্তানি সম্ভাবনাকে আরও বিস্তৃত করতে চাই। কুমিল্লা ইপিজেড দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি কেন্দ্র এখানে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ আরও শক্তিশালী করতে ইপিবি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে তিনি জানান।

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ছাড়াও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক আবদুল্লাহ আল মাহবুব, কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ সাইফুল ইসলাম ও কুমিল্লা চেম্বার অব কমার্সের সহ-সভাপতি জামাল আহমেদ।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

0 5 NOV 2025

Export cap fails to cool jute market as premium prices climb

SUZIT KUMAR DAS, *Faridpur*

The government's move to impose export restrictions on raw jute, aiming to stabilise domestic prices, has failed to produce the desired effect even after two months. In fact, as traders had warned, it has had the opposite effect, with premium-grade raw jute prices climbing further.

Medium-grade fibre has softened slightly but remains elevated, highlighting the limited impact of the export cap.

The export restriction, issued by the commerce ministry in September following recommendations from the textiles and jute ministry, requires prior approval for raw jute shipments. The measure was intended to ensure domestic mills could secure enough fibre at reasonable prices and curb rising costs for jute products.

High-quality jute, which sold for around Tk 4,000 per maund (37.32 kg) in September and October, is now trading at about Tk 4,300, according to Farhad Ahmed Akand, former chairman of the Bangladesh Jute Association.

In Faridpur, the largest producing district, the Department of Agricultural Marketing (DAM) reports premium jute selling for Tk 4,000-Tk 4,300 per maund, Tk 100-Tk 300 higher than before the export restrictions. Faridpur alone produces around 2.14 lakh tonnes of premium-grade jute annually, making it the country's main hub for high-quality fibre.

"Even though the government limited exports, prices in the market continue to rise," said Akhtaruzzaman Chan, a trader at Kanaipur market in Faridpur.

LOW PRODUCTION, TIGHT SUPPLY

Officials note that lower production this year has tightened domestic supply. Jute output fell 6.5 percent year-on-year to 89.5 lakh bales (one bale = 180 kg) in FY25 due to reduced acreage and unfavourable weather, according to Bangladesh Bureau of Statistics data.

"Due to low production, domestic supply is limited despite steady demand. This is why prices have not decreased even after export restrictions," said Shahadat Hossain, senior market officer at the Faridpur DAM.

Many farmers sold their jute early, expecting prices to drop because of the export restrictions. "Because of the export restrictions, we sold our jute quickly. Now we see prices rising. If exports had not been limited, we could have received better prices," said Anowar Molla of Jungurdi village in Faridpur's Nagarkanda upazila.

Lower yields compounded the problem. Moktar Molla, president of the Faridpur District Jute Farmers Association, said, "Cultivating one bigha costs Tk 40,000-Tk 42,000. We harvested only 5-6 maunds per bigha instead of the usual 10. After paying wages, many farmers are barely covering costs. Many thought prices would drop due to export limits, so they sold in September. But now, prices are increasing."

Medium-quality jute, used mainly for bags, sacks, hessian, and packaging, has declined modestly to Tk 3,600-Tk 3,700 per maund from around Tk 3,900. Md Omar Faruk Talukdar, assistant director at the Faridpur Jute Department, explained that high-quality fibre feeds export-oriented yarn mills, while medium grades cater to domestic demand, creating a natural price divergence.

HOARDING AND MARKET PRESSURE

Some traders point to alleged hoarding as another factor keeping prices elevated. "Hoarders are buying large quantities of jute and storing them to sell later at higher prices to mill owners. The government should take action against them," alleged Akand.

Talukdar noted, "Under government rules, anyone hoarding over 1,000 maunds of jute for more than a month is considered a hoarder, and action is taken. However, due to limited staff, not all cases can be addressed."

"This year, lower production has left demand in the market, pushing prices up. Without export restrictions, prices could have reached Tk 5,500, causing instability in the jute market," he added.

Raw jute exports declined following the restriction. During July-October of FY26, jute and jute goods exports together grew 4.7 percent year-on-year to $277 million, largely driven by yarn, twine, sacks, and bags. Raw jute shipments, however, remained lower.

The rebound comes after FY25, when exports of jute and jute goods fell to $820 million, the lowest in six years.

Farmers like Nab Kumar Kund of Raotara village in Magura Sadar describe a complex market. "Prices have increased mainly due to reduced production. We want prices high enough to encourage cultivation, but the government should ensure stability for all stakeholders," he said.

With import policy tweak, garment makers expect $5b more in exports

Govt amending import rules so factories can get all raw materials from buyers, instead of the current 50% limit

POLICY SHIFT

Govt to amend the Import Policy Order within two weeks	Will allow 100% raw material imports under free of charge (FoC)	Currently, factories can import only 50% under FoC	Less than 5% of exports use FoC

FoC means

- Buyers supply all raw materials, including fabric, accessories, trims, at no cost
- Factories only cut, stitch and make, earning a making charge
- Around 95% of exports still follow LCs, where factories pay for raw materials first

WHY EXPORTERS SUPPORT FOC

Less risk as buyers cannot cancel orders abruptly	No raw material cost; buyers pay and oversee quality	More export earnings stay in Bangladesh

Faster, simpler process that draws more high-end orders

EXPECTED ADDITIONAL APPAREL EARNINGS

Year after full FoC	Earnings
Year 1	$5b
Year 2	Over $10b

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladeshi apparel manufacturers expect to earn an additional $5 billion in high-end garment exports in the first year after the government scraps the 50 percent ceiling on free-of-charge (FoC) imports. Under this arrangement, the buyer supplies raw materials such as fabrics, accessories and other inputs.

They say the additional earnings could cross $10 billion in the second year once the FoC quota is fully abolished.

The Chief Adviser's Office says the commerce ministry has decided to amend the Import Policy Order within the next two weeks. The amendment will allow garment exporters to source all raw materials from overseas buyers, process them and ship the finished products back.

At present, exporters are permitted to import only 50 percent of the required raw materials under the FoC arrangement.

Md Shehab Udduza Chowdhury, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said Bangladesh could earn an extra $5 billion in exports in the first year of the FoC quota removal.

In the second year, he expects the value to cross $10 billion as factories can get all raw materials under the FoC arrangement.

A few years ago, FoC imports were capped at 33 percent of total raw materials. This was increased to 50 percent later.

Under FoC, international buyers supply fabrics, accessories and other inputs needed to produce export items. Local manufacturers receive only the cutting and making charge.

Local apparel exporters currently use FoC for less than 5 percent of total shipments due to restrictive conditions and reported complications at Chattogram customs.

Garment exporters say that FoC is straightforward, less risky and faster. Without any quota on FoC import, they believe global brands will place more orders in Bangladesh because of the country's skilled workforce and strong manufacturing capacity.

At present, more than 95 percent of garments are exported using usual letters of credit (LCs). FoC has seen limited uptake because of import restrictions and bureaucratic hurdles. BGMEA Vice-President Chowdhury said he submitted a proposal two months ago to ease the rules.

He said that Bangladesh exported $7 billion worth of garments made from man-made fibres in fiscal year 2022-23. Local textile mills supplied only 4 percent of the raw materials, with the rest imported, mainly from China.

Manufacturers say orders for high-end man-made fibre and polyester garments are shifting from China to Bangladesh as the United States has imposed higher tariffs on Chinese goods. Some Bangladeshi factories cannot take full advantage of it because they are barred from importing more than 50 percent of raw materials under the current FoC rules.

According to Chowdhury, FoC reduces risk because buyers cover raw material costs and cannot cancel orders abruptly. READ MORE ON B2

Under full FoC imports, he said that more foreign currency will remain within the country, as apparel-makers will no longer need to spend dollars upfront on raw material imports, as required under the LC system.

After the fifth Investment Coordination

to support all export-oriented sectors equally to increase export value and volume.

He said the garment industry has grown due to facilities such as bonded warehouses and that other potential sectors will also benefit if buyers supply all required raw materials.

"The government is

However, Showkat Aziz Russell, president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), said the government should consult all stakeholders before taking such an important decision.

He believes heavy imports of raw materials could harm the local textile industry by reducing

05 NOV 2025

The Daily Star

Order within two weeks | under free of charge (FoC) | import only 50% under FoC | exports use FoC

abruptly | oversee quality | Bangladesh

Faster, simpler process that draws more high-end orders

FoC means

Buyers supply all raw materials, including fabric, accessories, trims, at no cost

Factories only cut, stitch and make, earning a making charge

Around 95% of exports still follow LCs, where factories pay for raw materials first

EXPECTED ADDITIONAL APPAREL EARNINGS

Year after full FoC	Earnings
Year 1	$5b
Year 2	Over $10b

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladeshi apparel manufacturers expect to earn an additional $5 billion in high-end garment exports in the first year after the government scraps the 50 percent ceiling on free-of-charge (FoC) imports. Under this arrangement, the buyer supplies raw materials such as fabrics, accessories and other inputs.

They say the additional earnings could cross $10 billion in the second year once the FoC quota is fully abolished.

The Chief Adviser's Office says the commerce ministry has decided to amend the Import Policy Order within the next two weeks. The amendment will allow garment exporters to source all raw materials from overseas buyers, process them and ship the finished products back.

At present, exporters are permitted to import only 50 percent of the required raw materials under the FoC arrangement.

Md Shehab Udduza Chowdhury, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said Bangladesh could earn an extra $5 billion in exports in the first year of the FoC quota removal.

In the second year, he expects the value to cross $10 billion as factories can get all raw materials under the FoC arrangement.

A few years ago, FoC imports were capped at 33 percent of total raw materials. This was increased to 50 percent later.

Under FoC, international buyers supply fabrics, accessories and other inputs needed to produce export items. Local manufacturers receive only the cutting and making charge.

Local apparel exporters currently use FoC for less than 5 percent of total shipments due to restrictive conditions and reported complications at Chattogram customs.

Garment exporters say that FoC is straightforward, less risky and faster. Without any quota on FoC import, they believe global brands will place more orders in Bangladesh because of the country's skilled workforce and strong manufacturing capacity.

At present, more than 95 percent of garments are exported using usual letters of credit (LCs). FoC has seen limited uptake because of import restrictions and bureaucratic hurdles. BGMEA Vice-President Chowdhury said he submitted a proposal two months ago to ease the rules.

He said that Bangladesh exported $7 billion worth of garments made from man-made fibres in fiscal year 2022-23. Local textile mills supplied only 4 percent of the raw materials, with the rest imported, mainly from China.

Manufacturers say orders for high-end man-made fibre and polyester garments are shifting from China to Bangladesh as the United States has imposed higher tariffs on Chinese goods. Some Bangladeshi factories cannot take full advantage of it because they are barred from importing more than 50 percent of raw materials under the current FoC rules.

According to Chowdhury, FoC reduces risk because buyers cover raw material costs and cannot cancel orders abruptly. READ MORE ON B2

05 NOV 2025

The Daily Star

Under full FoC imports, he said that more foreign currency will remain within the country, as apparel-makers will no longer need to spend dollars upfront on raw material imports, as required under the LC system.

After the fifth Investment Coordination Committee meeting on Sunday, the Chief Adviser's Office said the commerce ministry has decided in principle to remove FoC quotas for fully export-oriented companies. The amendment is expected within two weeks and should reduce stockpiling costs and enhance competitiveness.

Md Abdur Rahim Khan, additional secretary at the commerce ministry, said the government wants to support all export-oriented sectors equally to increase export value and volume.

He said the garment industry has grown due to facilities such as bonded warehouses and that other potential sectors will also benefit if buyers supply all required raw materials.

"The government is trying to facilitate the businessmen by easing the rules," Khan told The Daily Star.

BGMEA President Mahmud Hasan Khan said removing the FoC quota would bring a lot of benefits to the garment sector, as buyers will pay for raw materials and the risk of cancelled orders will be lower.

"It was our long-time demand to the government," he added.

However, Showkat Aziz Russell, president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), said the government should consult all stakeholders before taking such an important decision.

He believes heavy imports of raw materials could harm the local textile industry by reducing demand for domestically produced yarn, fabrics and accessories, and lowering local value addition.

Md Shahriar, president of the Bangladesh Garments Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association, said removing the quota for FoC import would be beneficial if international buyers choose local accessory suppliers. Otherwise, he said, the sector may not gain.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
05 NOV 2025

'BILLION-DOLLAR CAGE'

What keeps leather from becoming Ba next export powerhouse?

Shadique Mahbub Islam
Journalist

ANALYSIS

When the tanneries were shifted from Hazaribagh to Savar in 2017, the move was billed as a green transformation. Yet, untreated waste still flows into the Dhaleshwari River, contaminating water and soil, jeopardising global certifications and therefore, holding back exports

Bangladesh's leather industry, like a few others, was once hailed as the "next RMG". Yet, despite having every natural advantage, including abundant raw hides, cheap labour, and decades of tanning heritage, its export earnings have been circling the same figure for over a decade — roughly a billion dollars a year.

In FY25, the sector earned $1.14 billion, contributing 2.3% to total export revenue.

It was the perfect candidate for export diversification; unlike ready-made garments (RMG), it relies almost entirely on domestic raw materials. Each Eid-ul-Azha, millions of animal hides flood the market, offering a near self-sustaining supply chain.

The industry also generates significant employment in rural and semi-urban areas, with nearly a million people involved across the value chain — from rawhide collection to finished goods.

Globally, the leather and footwear market size exceeds $420 billion. Bangladesh, with its cost advantage, could easily carve out a larger slice of the pie. In fact, sector leaders estimate an export potential of $10 billion annually, if compliance and infrastructure gaps were bridged.

But instead of scaling upward, exports have stagnated since 2012, when they peaked around $1.24 billion. Today, even after modest growth, the figure remains stuck in the same orbit — a phenomenon many now call the "billion-dollar cage".

Industry insiders say it could easily earn five times that amount if only policy and compliance barriers were addressed. So why does the dream of transforming leather into Bangladesh's next export powerhouse remain trapped behind a mix of bureaucratic inertia, structural weakness, and environmental neglect?

Without LWG certification, local exporters are forced to sell semi-processed 'wet blue' leather to China at discounts of up to 60%.

Policy paralysis and fragmented governance

Unlike the RMG sector, leather has no unified export strategy. Incentives are scattered across ministries, and regulatory oversight remains fragmented between the industries ministry, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC), and the Department of Environment.

Professor Mustafizur Rahman, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), said,

I SEE PAGE 6 COL 1

The Business Standard
05 NOV 2025

'BILLION-DOLLAR CAGE'

What keeps leather from becoming Bangladesh's next export powerhouse?

...que Mahbub Islam

...SIS

...the tanneries were ... from Hazaribagh ...ar in 2017, the ...vas billed as a ...ransformation. Yet, ...ted waste still flows ...e Dhaleshwari River, ...inating water and ...pardising global ...tions and therefore, ... back exports

...desh's leather industry, like a ...thers, was once hailed as the ...RMG". Yet, despite having every ...ntage, including abundant raw ... labour, and decades of tan...e, its export earnings have been circling the same figure for over a decade – roughly a billion dollars a year.

In FY25, the sector earned $1.14 billion, contributing 2.3% to total export revenue.

It was the perfect candidate for export diversification; unlike ready-made garments (RMG), it relies almost entirely on domestic raw materials. Each Eid-ul-Azha, millions of animal hides flood the market, offering a near self-sustaining supply chain.

The industry also generates significant employment in rural and semi-urban areas, with nearly a million people involved across the value chain – from rawhide collection to finished goods.

Globally, the leather and footwear market size exceeds $420 billion. Bangladesh, with its cost advantage, could easily carve out a larger slice of the pie. In fact, sector leaders estimate an export potential of $10 billion annually, if compliance and infrastructure gaps were bridged.

But instead of scaling upward, exports have stagnated since 2012, when they peaked around $1.24 billion. Today, even after modest growth, the figure remains stuck in the same orbit – a phenomenon many now call the "billion-dollar cage".

Industry insiders say it could easily earn five times that amount if only policy and compliance barriers were addressed. So why does the dream of transforming leather into Bangladesh's next export powerhouse remain trapped behind a mix of bureaucratic inertia, structural weakness, and environmental neglect?

Without LWG certification, local exporters are forced to sell semi-processed 'wet blue' leather to China at discounts of up to 60%.

Policy paralysis and fragmented governance

Unlike the RMG sector, leather has no unified export strategy. Incentives are scattered across ministries, and regulatory oversight remains fragmented between the industries ministry, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC), and the Department of Environment.

Professor Mustafizur Rahman, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), said,

I SEE PAGE 6 COL 1

"

I think our biggest challenge right now is compliance. Many of our tanneries have been classified because they failed to meet compliance requirements. The relocation process in 2017 was not carried out properly, which is why most of the factories ended up losing their classification. If BSCIC had managed that relocation properly, this problem might never have arisen in the first place."

•••••

MD SHAHEEN AHAMED, CHAIRMAN, BANGLADESH TANNERS ASSOCIATION

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ঢাকা।

The Business Standard
05 NOV 2025

"Unlike the RMG sector, which has long enjoyed bonded warehouse facilities, the leather industry had been asking for the same for decades. Such a facility would have allowed them to import inputs duty-free. Yet, it took the government several decades to grant it — only doing so in the very recent past."

Disjointed governance has created operational chaos.

While the government encourages collective waste treatment, some tannery owners were told to install their own Effluent Treatment Plants (ETPs) — a cost most small and medium firms cannot bear. This tug-of-war between centralised and decentralised waste management has paralysed progress.

Rahman said, "To steadily expand exports in the leather sector, issues like effluent treatment, environmentally friendly production, and waste management have now become absolute priorities."

The irony is that Bangladesh's leather story mirrors the early days of its garment revolution — an industry with huge domestic input, low costs, and high global demand. But unlike RMG, the leather sector never received sustained policy nurturing.

Where garments benefited from bonded warehouse facilities, back-to-back LCs, and export incentives, leather faced bureaucratic red tape and inconsistent leadership. Where RMG invested in green compliance and certification, leather ignored the writing on the wall. And where garment factories adapted to changing buyer demands, many tanneries clung to outdated production methods.

The compliance problem

The Savar tannery estate, a crucial hub for the industry, remains incomplete, while its Central Effluent Treatment Plant (CETP) is poorly maintained and continues to release untreated water.

When the tanneries were shifted from Hazaribagh in 2017, the move was billed as a green transformation. The new industrial estate promised modern waste treatment, better safety and cleaner production standards. Instead, it became a costly blunder.

The CETP, the linchpin of the estate, was never completed properly. Built at a cost of Tk565 crore, the plant remains under-capacity, treating only about 14,000 cubic metres of wastewater daily against a peak demand of 35,000 cubic metres during Eid seasons.

The result: Untreated waste still flows into the Dhaleshwari River, contaminating water and soil, and jeopardising global certifications.

This environmental non-compliance has effectively locked Bangladesh out of premium global supply chains. The Leather Working Group (LWG), an international certification body recognised by brands like Nike, Adidas and Timberland, remains the gatekeeper of global sourcing.

Italy boasts 952 LWG-certified factories, India 334, and Pakistan 62 — but Bangladesh has fewer than 10. Without certification, local exporters are forced to sell semi-processed "wet blue" leather to China at discounts of up to 60%.

Compliance is not merely an environmental issue — it is an economic one. The absence of LWG certification costs Bangladesh around $500 million in lost export earnings every year. Foreign buyers, especially European ones, now avoid Bangladeshi leather altogether.

Md Shaheen Ahamed, chairman of Bangladesh Tanners Association (BTA), said, "I think our biggest challenge right now is compliance. Many of our tanneries have been classified because they failed to meet compliance requirements. The relocation process in 2017 was not carried out properly, which is why most of the factories ended up losing their classification. If BSCIC had managed that relocation properly, this problem might never have arisen in the first place."

The compliance gap also has ripple effects on finance.

Banks are increasingly reluctant to extend credit to tanneries without proper environmental documentation, leading to liquidity crises. Cash-strapped producers are forced to sell hides at low prices, perpetuating a cycle of underinvestment.

Rahman said, "Even though we relocated the tanneries from Hazaribagh to Savar, we never managed to make the effluent treatment plant fully functional. As a result, our rivers continue to be contaminated. Because of this environmental non-compliance, many buyers are reluctant to source from Bangladesh. It's not just that regulations in many countries have become stricter; consumers themselves now demand eco-friendly production and proper certification. Without those, they simply won't buy. That's another major constraint."

Even within the domestic market, inefficiencies abound. There is no standard rawhide grading system, no organised auction mechanism, and limited vertical integration between tanneries and footwear manufacturers. Many tanners sell to middlemen who add no value, eroding margins further.

A workforce left behind

While the industry is more than 70 years old, its labour practices remain stuck in the past. According to the Tannery Workers' Union, a large share of workers still lack formal contracts, minimum wages, or proper identity cards. Health and safety standards are weak, and social compliance — now a prerequisite for export competitiveness — is largely absent.

This neglect not only undermines global certification but also limits productivity. Global buyers increasingly demand traceable, ethically sourced materials, and worker welfare is a key part of that equation. Without reform, Bangladesh's leather sector risks being seen as both environmentally and socially regressive.

Ahamed said, "The leather sector makes a substantial contribution to the national economy and to GDP — especially in terms of employment, domestic demand, and export earnings. From rawhide collection to the production of finished leather goods, the sector engages a large workforce.

"If we could overcome the compliance barriers, we could easily expand our output four or fivefold. But the reality is that we are unable to utilise our skilled workforce fully because of these compliance issues," he added.

The industry's development requires much more investment in technology, skilled manpower and product design. To promote high-end leather goods, we need strong fash-

ion and design institutes that can train specialised professionals. But such institutions will not emerge from the private sector alone. This is where the state's support was crucial—yet that support never really materialised.

"Access to skills, to fashion and design professionals, and to modern technology—all these have played a role in limiting the sector's growth, " said Dr Mustafiz.

"This is particularly frustrating because Bangladesh produces very high-quality leather. Unlike ready-made garments, where value addition is around 55–65%, in leather goods it can reach 80–90%."

The billion-dollar question

Can Bangladesh's leather sector ever break free of its billion-dollar cage? The potential is undeniable: a self-sufficient raw material base, proven manufacturing capability, and proximity to major markets. But potential alone is not power.

The failure to operationalise Savar's CETP, the absence of credible certification, and the lack of an integrated export policy have collectively eroded global confidence. While global demand for ethically sourced leather goods grows each year, Bangladesh remains excluded from the conversation.

In the coming years, environmental requirements will become even more stringent across global markets. This will be a major constraint if we are not prepared. From the kind of energy used to whether production processes are carbon-friendly, environmental sustainability will only grow in importance.

Rahmna believes this sector still holds enormous potential. The value addition is high, and with the right focus — on environmental readiness, carbon emission reduction, workers' rights, global assurance, and proper waste treatment — it could transform into a major export earner.

"So, we must make a concerted effort to pursue both avenues," he added.

Ahamed said their biggest requirement is to make the Savar industrial estate fully compliant — particularly in terms of managing both liquid and solid waste.

"At the same time, we need to consider the financial strain the tannery owners are facing. Many of them have lost their working capital — nearly Tk10,000–12,000 crore in total — after investing in factory buildings at Savar," he added.

Ahamed further said that if the government could provide Tk3,000–4,000 crore as new working capital, businesses could resume smooth operations.

"Those who are capable of obtaining LWG certification should be prioritised for soft loans so that they can install individual effluent treatment plants, invest in compliance upgrades, and rebuild their operations. With this kind of targeted financial and policy support, the sector could expand rapidly once again," he said.

The leather industry's stagnation is thus more than an economic failure; it is a governance failure. It reveals how institutional neglect can trap even a high-potential sector in perpetual underperformance.

Until Bangladesh learns to align its policy priorities with its industrial ambitions, the promise of a "next RMG" will remain just that — a promise, fading slowly in the smell of untreated tannin and lost opportunity.